ইউনিট
৪

মাছ ও চিংড়ির রোগ ও ব্যবস্থাপনা

মাছ ও চিংড়ি জলজ প্রাণি। প্রাণি মাত্রই বিভিন্ন রোগের শিকার হয়, মাছ ও চিংড়ি এর ব্যতিক্রম নয়। জলজ পরিবেশের যাবতীয় গুণাগুনের অনুকূল মাত্রা এবং সুষম পুষ্টির যোগান মাছ ও চিংড়ির সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন বজায় রাখার পূর্বশর্ত। জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রোগ জীবাণু, কীটপতঙ্গ বাস করে এবং এরা সেখানে বাসকারী মাছ ও চিংড়ির সাথে এক ধরনের দূর্বল ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। কোনো কারণে জলজ পরিবেশের অবনতি বা দূষণ ঘটলে এর একটি ক্ষতিকর প্রভাব মাছ ও চিংড়ির ওপর পড়ে এবং এদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। যার ফলে মাছ ও চিংড়ি দূর্বল হয়ে যায় এবং ঠিক এসময়ই ওৎপেতে থাকা রোগ-জীবাণু এদেরকে আক্রমণ করে এবং এরা রোগক্রান্ত হয়ে পড়ে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মাছ ও চিংড়ির রোগ, রোগের কারণ, রোগের-লক্ষণ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১ : মাছের রোগ সৃষ্টিকারী নিয়ামক সমূহ ও তাদের আন্তঃক্রিয়া
পাঠ - ৪.২ : মাছের রোগ ও তার প্রতিকার
পাঠ - ৪.৩ : চিংড়ির রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা
পাঠ - ৪.৪ : ব্যবহারিক : বাহ্যিক লক্ষণ দেখে সুস্থ ও রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্তকরণ

পাঠ-৪.১ মাছের রোগ সৃষ্টিকারী নিয়ামকসমূহ ও তাদের আন্তঃক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রোগ কী তা সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- মাছের ও চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর আন্ত:ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	রোগজীবণু, রোগ পরিবেশগত ধকল, বাহ্যিক প্রতিবন্ধক।

সহজ কথায় রোগ বলতে যে কোনো প্রাণির দেহ ও মনের অস্বাভাবিক অবস্থাকে বুঝায় যা বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ, চিহ্ন বা আচরনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মাছ বা চিংড়ির রোগ বলতে প্রতিকূল পারিবেশিক অবস্থায় মাছ বা চিংড়ির ওপর সৃষ্ট ধকল বা চাপের (Stress) কারণে দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল হয়ে যাওয়া এবং রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রমণের শিকার হওয়াকে বুঝায় যা বিশেষ কিছু লক্ষণ, চিহ্ন বা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাছ বা চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী প্রধান উপাদান বা নিয়ামক ৩টি। যথা

(১) পরিবেশগত ধকল বা চাপ
(২) পোষক মাছ/চিংড়ির সংবেদনশীলতা
(৩) কার্যকর রোগজীবাণু/পরজীবী

উল্লেখিত কার্যকারণ ছাড়াও মাছ ও চিংড়ির রোগ সংগঠনের জন্য নিম্নোক্ত নিয়ামগুলোকেও দায়ী করা যায়

(১) বংশানুক্রম
(২) পুষ্টিমান
(৩) অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ
(৪) ক্রটিপূর্ণ পরিবহণ এবং হ্যান্ডেলিং
(৫) উল্লিখিত সবগুলো কারণের আন্ত:ক্রিয়া।

এখানে মাছ ও চিংড়ির রোগসৃষ্টিকারী উপাদান বা কারণগুলোকে আরো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো-

(১) পরিবেশগত ধকল বা চাপ : চাপ সৃষ্টিকারী এবং অস্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশের জন্য দায়ী কারণগুলো নিম্নরূপ-

(ক) পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি

- পানির অধিক তাপমাত্রা এবং শীতল অভিঘাত
- পানির ঘোলাত্ব
- পানির কটু গন্ধ বা গন্ধযুক্ত পানি
- হাইপোক্সিয়া/অ্যানোক্সিয়া/হাইপারোক্সিয়া
- এসিডোসিস/ অ্যালকালোসিস
- বিষাক্ত গ্যাস যেমন- অ্যামোনিয়া (NH_3), নাইট্রাইট (NO_2), হাইড্রোজেন সালফাইড (HS_2) এর উপস্থিতি।
- মাত্রাতিরিক্ত জৈব তলানি
- এগ্রোকেমিক্যাল দূষণ (কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার)
- কল-কারখানার বর্জ্যজনিত দূষণ
- পয়: নর্দমাবাহিত ময়লার কারণে দূষণ
- পানিতে ভারী ধাতুর ঘনত্বজনিত দূষণ

(খ) পানির জৈবিক গুণাগুণের অবনিত

জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের যারা একই পরিবেশে মাছ ও চিংড়ির সংগে অবস্থান করে তাদের আধিক্যজনিত কারণে জলাশয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়। যেমন-

- জলাশয়ে সাপ, ব্যাঙ, উদবিড়াল ইত্যাদি রাক্ষুসে প্রাণির উপদ্রব
- বিভিন্ন মৎস্যভূক পাখি যেমন- বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ির উপদ্রব
- বিভিন্ন পরজীবীর মাধ্যমিক পোষক যেমন- শামুক, ঝিনুক ইত্যাদির আধিক্য
- জলজ আগাছার আধিক্য
- নীলাভ সবুজ শৈবাল এর আনাধিক্যজনিত ব্লুম

(২) রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ :
(ক) এককোষী ও বহুকোষী পরজীবী (খ) ভাইরাস (গ) ব্যাকটেরিয়া (ঘ) ছত্রাক

(৩) পুষ্টিজনিত কারণ :
(ক) প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব (খ) সুষম সম্পূরক খাদ্যের অভাব (গ) পুষ্টির আধিক্য

(৪) উৎপাদন উপকরণ এবং ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কারণ :
(ক) ত্রুটিপূর্ণভাবে বড় মাছ বা পোনা পরিবহণ ও হ্যান্ডেলিং
(খ) ত্রুটিপূর্ণভাবে পুকুর/জলাশয় প্রস্তুতকরণ
(গ) আঘাতপ্রাপ্ত মাছ/মাছের পোনা মজুদকরণ
(ঘ) অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদকরণ
(ঙ) অন্য জলাশয়ে ব্যবহৃত জাল বা উপকরণ শোধন না করে ব্যবহার

রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর আন্তঃক্রিয়া :

মাছ/চিংড়ির রোগ সংগঠনে আন্ত:ক্রিয়াশীল তিনটি উপাদান প্রধান ভূমিকা রাখে। উপাদান তিনটি হলো- (ক) পরিবেশের ধকল/চাপ (খ) পোষকের সংবেদনশীলতা এবং (গ) কার্যকর রোগজীবাণু। এদের আন্ত:ক্রিয়া নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

চিত্র ৪.১.১ : পোষক, পরিবেশ এবং রোগজীবাণুর আন্ত:ক্রিয়া

কোন জীবের পরিবেশ হলো তার অবস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। মাছ/চিংড়ি হলো জলজ প্রাণি। কাজেই, মাছ/চিংড়ির পরিবেশ হলো পানি এবং এর ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক অবস্থা। জলজ পরিবেশে মাছ/চিংড়ির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুও বসবাস করে। একই জলজ পরিবেশে বসবাসকারী মাছ/চিংড়ি এবং রোগজীবাণুর মধ্যে একটি দূর্বল ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান। এ অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত জলাশয়ে মাছ/চিংড়ির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বজায় থাকে। অর্থাৎ পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক অবস্থা মাছ/চিংড়ির বসবাসের জন্য অনুকূল থাকে। যখন জলাশয়ে মাছ/চিংড়ির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বিঘ্নিত হয় বা অনুপস্থিত থাকে, তখন পরিবেশগত একটা ধকল/চাপের সৃষ্টি হয়। এরকম ধকলপূর্ণ অস্বাভাবিক পরিবেশ রোগজীবাণুর বসবাসের জন্য অনুকূল হলেও মাছ/চিংড়ির জন্য তা মোটেও সুখকর হয় না। এরূপ অবস্থায় মাছ/চিংড়ির শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে,শরীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয় এবং এরা অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এই সুযোগে সুযোগ-সন্ধানী রোগজীবাণু মাছ/চিংড়িকে আক্রমণ করার প্রয়াস পায়। পারিবেশিক ধকলে পিষ্ঠ মাছ/চিংড়ি এসব রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না এবং রোগাক্রান্ত হয়। একটি উদাহরনের সাহায্যে ব্যাপারটিকে সহজে বুঝানো যায়। যখন কোন জলজ পরিবেশে জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, তখন মাছ/চিংড়ির জন্য অনুকূল পরিবেশ বিঘ্নিত হয়; কিন্তু রোগজীবাণুর জন্য অনুকূল পারিবেশ সৃষ্টি

হয়। এরূপ অস্বাভাবিক পরিবেশিক পরিস্থিতিতে মাছ/চিংড়ির জীবন যখন বিপর্যস্ত ঠিক তখনই তারা রোগজীবাণুর আক্রমণের শিকার হয। ফলে মাছ/চিংড়ির রোগ দেয়া দেয়।

রোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া : প্রাথমিকভাবে পোষক (মাছ/চিংড়ি) তার বাহ্যিক প্রতিবন্ধক (যেমন-ত্বক, আঁইশ, খোলস, মিউকাস মেমব্রেন দ্বারা সংক্রামক রোগজীবাণুকে দেহে প্রবেশে বাধা দেয়। তবে যখন কোন রোগজীবাণু/পরজীবী তার অনুকূল পরিবেশে পোষকের দেহের ভিতরে প্রবিষ্ট হয় বা বহিঃরাঙ্গে আবদ্ধ হয়, তখন রোগ সংক্রামণ নিম্নোক্ত তিনটি ধাপে হতে পারে-

পোষকের দৈহিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংক্রমণ প্রতিহত করে এবং রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে পোষক সুস্থ্য থাকে।

↓

পোষকের দৈহিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা রোগের সংক্রামণ প্রতিহত করে, কিন্তু রোগজীবাণুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে না। এক্ষেত্রে পোষাক রোগজীবাণুর বাহকে পরিণত হয়, কিন্তু রোগের লক্ষণের প্রকাশ ঘটে না। এটি হলো সুপ্তাবস্থা। এরূপ অবস্থায় পোষকের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা দূর্বল হলেই রোগের প্রকোপ ঘটে।

↓

রোগজীবাণু পোষকের দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং পোষকের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে। ফলে মাছ রোগাক্রান্ত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাছের রোগ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রাণি মাত্রই বিভিন্ন রোগের শিকার হয়। রোগ হল শরীর ও মনের অস্বাভাবিক অবস্থা। পরিবেশগত ধকল, পোষকের সংবেদনশীলতা এবং রোগজীবাণু ছাড়াও বিভিন্ন কার্যকারণ রোগ সংগঠনের জন্য দায়ী। প্রতিটি প্রানেরই নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিপর্যস্ত হলেই রোগ দেখা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মাছ ও চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী প্রধান উপাদান কয়টি?
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

২। রোগজীবাণু দেহে প্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী বাহ্যিক প্রতিবন্ধক নয় কোনটি?
(ক) ত্বক/খোলস (খ) আঁইশ
(গ) পাখনা (ঘ) মিউকাস

৩। পানির অক্সিজেন শুন্য অবস্থা কোনটি?
(ক) Anoxia (খ) Hypoxia
(গ) Hyperoxia (ঘ) Acidosis

পাঠ-৪.২ মাছের রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুস্থ্য ও রোগাক্রান্ত মাছের সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মৎস্য রোগের শ্রেণী বিন্যাস করতে পারবেন।
- মাছের বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ও পরজীবীঘটিত রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকারের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অপুষ্টিজনিত অসংগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- মৎস্য রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, পরজীবী, এন্টিবায়োটিক

আমাদের দেশে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মাছ চাষ বেশ লাভজনক। মাছ চাষ করে মৎস্যচাষী ও খামারীরা একদিকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়, অন্যদিকে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাছাড়া চাষকৃত মাছ বিদেশে রপ্তানি করে করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো প্রতি বছর রোগের কারণে এ খাতটি আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। মাছের রোগ ও রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই মাছের রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। রোগ হলো দেহ ও মনের অসুস্থ্য অবস্থা যা বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সুস্থ্য মাছের চলা-ফেরা আচার আচরণ খাদ্য গ্রহণ সবকিছুই স্বাভাবিক থাকে। অপরদিকে, অসুস্থ্য মাছ বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক আচার-আচরণ দেখায়। এই পাঠে মাছের বিভিন্ন ধরনের রোগ, রোগের সাধারণ লক্ষণ, রোগের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তবে মাছের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, তাই এখানে রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় নিয়েও আলোচনা করা হবে।

সুস্থ্য মাছের সাধারণ লক্ষণসমূহঃ

সুস্থ্য মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ, রোগাক্রান্ত মাছের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্ত করতে হলে অনুরূপ একটি সুস্থ্য মাছের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জানতে হবে। নিম্নে একটি সুস্থ্য মাছের সাধারণ লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হলো-

- সুস্থ্য মাছ স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে কাঙ্খিত আকার ও ওজন অর্জন করবে।
- দেহের স্বাভাবিক চাকচিক্য ভাব অটুট থাকবে।
- মাছ স্বাভাবিক ও স্বত:স্ফুর্তভাবে খাবার খাবে।
- সুস্থ মাছ পানির উপরে অলসভাবে বসে থাকবে না এবং ভয় দেখালে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যাবে।
- দেহের কোথাও কোন অস্বাভাবিক দাগ থাকবে না।
- দেহের কোনো অংশে ঘা বা রক্তক্ষরণ থাকবে না।
- পাখনা দুমড়ানো থাকবে না এবং ফুলকায় কোন ধরনের পচন থাকবে না,
- দেহের কোথাও কোন পরজীবী আটকে থাকবে না।
- সুস্থ্য মাছ স্বাভাবিক আচরণ করবে।

রোগাক্রান্ত মাছের সাধারণ লক্ষণসমূহঃ

- মাছ রোগাক্রান্ত হলে দৈহিক চাকচিক্য ভাব এবং স্বাভাবিক সতেজতা নষ্ট হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে।
- রোগাক্রান্ত মাছ খাবারের প্রতি অনীহা দেখাবে, কখনও কখনও খাবার খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিবে।
- শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে এক জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে এবং সাঁতারে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হবে।

- পানির উপরে অথবা কিনারায় অলসভাবে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকবে এবং ভয় দেখালেও নড়তে চাইবে না।
- রোগাক্রান্ত মাছের দেহে অতিরিক্ত মিউকাস (mucus) নির্গত হবে।
- আঁইশ, ত্বক, পাখনা, ফুলকা অথবা পায়ু পথের গোড়ায় ক্ষত বা ঘা দেখা দিবে; কখনও কখনও পচন দেখা দিতে পারে।
- রোগাক্রান্ত হলে অনেক সময় মাছের আঁইশ খসে পড়তে পারে এবং চোখ অক্ষিকোটরের বাইরে বের হয়ে আসতে পারে।
- মাছের দেহগহ্বরে তরল জমে পেট ফুলে যেতে পারে।
- দেহের বহি:রাংশ এবং ফুলকায় পরজীবী আটকে থাকতে পারে।
- রোগাক্রান্ত মাছের ত্বক বা পাখনায় অনেক সময় ছোট ছোট সাদা দাগ বা ফোসকা দেখা যেতে পারে।
- মাছ রোগগ্রস্থ হলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বন্ধ হয়ে যাবে এবং অনেকসময় দেহের তুলনায় মাথার আকার বড় রোগাক্রান্ত দেখাবে।
- হঠাৎ করে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দিলেও বুঝতে হবে মাছ রোগাক্রান্ত হয়েছে।

মাছের রোগের শ্রেণিবিভাগ :

রোগ সৃষ্টিকারী কারণের উপর ভিত্তি করেই মূলত মাছের রোগের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। যথা-

(১) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ : বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে হয়। যেমন- ব্যাকটেরিয়াজনিত ফুলকা পচা রোগ, পাখনা ও লেজ পচা রোগ ইত্যাদি।

(২) ছত্রাকজনিত রোগ : এ ধরনের রোগ সৃষ্টির কারণ হলো ছত্রাক। যেমন- ব্রাঙ্কিওমাইকোসিস, ক্ষতরোগ ইত্যাদি।

(৩) ভাইরাসজনিত রোগ : ভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্ট রোগ। যেমন- স্প্রিং ভাইরেমিয়া, র‍্যাবডোভাইরাস রোগ ইত্যাদি।

(৪) পরজীবীঘটিত রোগ: বিভিন্ন ধরনের এককোষী ও বহুকোষী পরজীবীর আক্রমণে এ রোগ হয়। যেমন- মাছের সাদা দাগ রোগ, মাছের উকুন, কৃমিরোগ ইত্যাদি।

(৫) অপুষ্টিজনিত রোগ : মাছের খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের স্বল্পতার কারণে মাছে নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন- প্রোটিনের অভাবজনিত রোগ, লিপিডের অভাবজনিত রোগ, ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ, খনিজ লবণের অভাবজনিত রোগ ইত্যাদি।

(৬) পুষ্টির আধিক্যজনিত রোগ: পুষ্টি উপাদানের আধিক্যের কারণে হয়।

(৭) খাদ্যস্থিত পুষ্টিবিরোধী উপাদানের কারণে সৃষ্ট রোগ: মাছের খাদ্য তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ উপাদান ব্যবহৃত হয় যাতে অনেক ধরনের পুষ্টিবিরোধী উপাদান থাকে। এসব উপাদান খাদ্যের পুষ্টি শোষনে বাধা দেয় এবং মাছকে নাজুক পরিস্থিতির দিকে দিকে ঠেলে দেয়।

(৮) অন্যান্য কারণে সৃষ্ট পুষ্টিজনিত রোগ : অনেক সময় খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক ও গ্রোথ ফ্যাক্টর (Growth factor) ব্যবহার করা হয়। এসব উপাদানের লাগামহীন ব্যবহার অনেক সময় মাছকে রোগের দিকে ঠেলে দিবে পারে। তাছাড়া চর্বিযুক্ত মৎস্য খাদ্যের জারনের ফলে উৎপন্ন পারক্সাইড, এলডিহাইড, কিটোন মাছের জন্য ক্ষতিকর।

মৎস্য রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার :

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ:

(১) ব্যাকটেরিয়াজনিত ফুলকা পঁচা রোগ (Bacterial gill disease**) :**

Myxococcus piscicolus নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের জন্য দায়ী। গ্রাসকার্প ও কমনকার্পের জন্য এটি একটি মারাত্নক রোগ। তবে দেশীয় কার্পজাতীয় মাছেও কখনও কখনও এ রোগ দেখা যায়। এটি একটি সংক্রামক রোগ এবং খুবই দ্রুত ছড়ায়।

লক্ষণ :

- মাছের দেহ বিশেষ করে মাথা কালচে বর্ণ ধারণ করে।
- মাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

- মাছের ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় এবং মাছ এবড়ো-থেবড়ো চলাফেরা করে।
- মাছের ফুলকা রশ্মি কাদা ও অধিক পিচ্ছিল পদার্থে আবৃত থাকে।
- মাছের ফুলকা ফুলে যায়, ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে ও পচে যায়।
- মারাত্মক অবস্থায় মাছের কানকো পচে যায় এবং কানকো অস্বচ্ছ দেখায়।
- আক্রান্ত মাছের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিদিন মারা যেতে পারে।

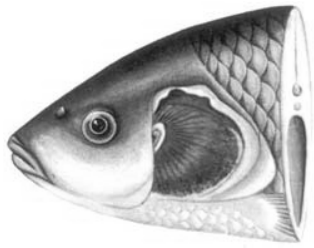

চিত্র ৪.২.১ : ফুলকা পচা রোগ আক্রান্ত গ্রাসকার্প

প্রতিকার :

বিভিন্ন পন্থায় এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। যেমন-

- ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে জলাশয়ের পানি জীবাণুমুক্ত করা যেতে পারে।
- এটি যেহেতু ব্যাকটোরিয়াঘটিত রোগ তাই এ রোগের চিকিৎসার জন্য এন্টিবায়োটিক (যেমন- Erythromycin) ব্যবহার করা হয়।
- পুকুরে মাঝে মাঝে পরিমিত মাত্রায় চুন ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতিষেধক প্রদান (immunization) করেও এ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

২। লেজ ও পাখনা পচা রোগ (Tail and Fin rot disease):

সিউডোমোনাস (Pseudomonas) এবং অ্যারোমোনাস (Aeromonas) গণের কয়েকটি প্রজাতির ব্যাকটোরিয়ার সংক্রামণে মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়। যথা এ রোগ সৃষ্টিকারী অন্যতম ব্যাকটেরিয়া হলো- *Pseudomonas flurescens*. মিঠা পানির কার্পজাতীয় মাছ এবং ক্যাটফিশে এ রোগ দেখা দেয়। জলজ পরিবেশের বিভিন্ন নিয়ামকের যথাযথ মাত্রার হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

লক্ষণ :

- মাছের দেহের পিচ্ছিল আবরণ কমে যায়।
- মাছের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য থাকে না এবং আক্রান্ত মাছ কালচে বর্ণ ধারন করে।
- মাছ খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়।
- লেজ ও পাখনায় সাদা সাদা দাগ পড়ে।
- লেজ ও পাখনায় পচন ধরে এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়।
- মাছ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ভারসাম্যহীনভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে চলাফেরা করে।
- মাছের শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং শরীর ফ্যাকাশে হয়।

চিত্র ৪.২.২ : লেজ ও পাখনা পচা রোগে আক্রান্ত মাছ

প্রতিকার/চিকিৎসা :

- আক্রান্ত পাখনা কেটে ফেলে ২% সিলভার নাইট্রেট বা ২.৫% সাধারণ লবণ পানিতে গোসল করাতে হবে।
- প্রতি কেজি খাবারে ২৫ মি.গ্রা. টেট্রাসাইক্লিন মিশিয়ে পরপর ৭ দিন খাওয়াতে হবে।
- টেট্রাসাইক্লিন ২০ মি.গ্রা/কেজি হারে ইনজেকশন হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ কল্পে নিচের কাজগুলো করতে হবে।
  ১. পুকুরে মজুদকৃত মাছের ঘনত্ব কমাতে হবে।
  ২. নির্দিষ্ট দিন পরপর পুকুরে পরিমিত পরিমাণ (সাধারণত শতাংশে ১ কেজি) চুন প্রয়োগ করতে হবে।
  ৩. জৈব সারের ব্যবহার সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হবে।
  ৪. নিয়মিত জাল/হররা টেনে পুকুরের তলার বিষাক্ত গ্যাস কমিয়ে আনতে হবে।

ছত্রাকজনিত রোগঃ

(১) ব্রাঙ্কিওমাইকোসিস (Branchiomycosis)

এই রোগ মাছের ফুলকা পঁচা রোগ (Gill Rot Disease) নামেও পরিচিত।

কারণ/রোগজীবাণু : ব্রাঙ্কিওমাইসিস (Branchiomyces) নামক এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সংঘটিত হয়। ব্রাঙ্কিওমাইসিস গণের দুইটি প্রজাতির ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগের প্রাদূর্ভাব ঘটে। যথা- *Branchiomyces sanguinis* এবং *Branchiomyces demigrans*.

রোগের বিস্তার : প্রায় সব ধরনের কার্পজাতীয় মাছেই এ রোগ সংঘটিত হয়। কোন কোন প্রজাতির ক্যাটফিশেও এ রোগ দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে এবং পুকুরে মাত্রাতিরিক্ত উদ্ভিদপ্ল্যাংকটন উৎপাদিত হলে এ রোগের সংক্রমন বেশি ঘটে। মাছের অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব এ রোগের একটি অন্যতম কারণ। এ রোগে ছত্রাক মাছের ফুলকাকে আক্রান্ত করে। তন্তুজাতীয় ছত্রাক ফুলকার মধ্যে ঢুকে রক্তসংবহন নালিকায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে ফুলকার বহিরাংশে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং মাছ রোগাক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ :

- ফুলকা স্বাভাবিক রং ও ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে।
- সংক্রমণের শুরুতে ফুলকা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং পরে ফুলকায় গাঢ় লাল বর্ণের দাগ দেখা যায়।
- আক্রান্ত ফুলকা ধীরে ধীরে হলদে-বাদামী বর্ণ ধারণ করে।
- ফুলকায় পচন ধরে এবং ফুলকা রশ্মি খসে পড়ে যায়।
- মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

চিত্র ৪.২.৩ : ফুলকা পচা রোগ

প্রতিকার/চিকিৎসা :

আমাদের দেশের মিঠা পানির প্রায় সকল মাছই ছত্রাক রোগে সংবেদনশীল। বিশেষ করে ত্বক ও ফুলকাতে আঘাতজনিত কারণে সহজেই ছত্রাক আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। ছত্রাকজনিত রোগের চিকিৎসা নিম্নলিখিত উপায়ে করা যেতে পারে।

i) আক্রান্ত পুকুরে ০.১৫-০.২০ ppm হারে ম্যালাকাইট গ্রীন প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ii) আক্রান্ত পোনা বা ডিম ০.১০-০.১৫ ppm মিথিলীন ব্লু দ্রবণে ধৌত করালে বা ১-২ ঘন্টা গোসল করালে প্রতিকার পাওয়া যায়।

iii) আক্রান্ত মাছকে ২.০- ২.৫% লবণ পানিতে যতক্ষণ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্ত মাছকে ০.৫ ppm তুঁতে (Copper sulphate) দ্রবণে ডুবানোর জন্য উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে তুঁতে খুব বিষাক্ত এবং ক্ষতিকারক তাই যতদূর সম্ভব তুঁতে দ্বারা চিকিৎসা না করানো ভাল।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিচের কাজগুলো করা যেতে পারে–

iv) পুকুরে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ জমতে দেওয়া যাবে না।

v) মাঝে মাঝে পরিমিত মাত্রায় চুন প্রয়োগ করতে হবে।

(২) ক্ষতরোগ

ক্ষতরোগ মাছ চাষে একটি প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশে ক্ষতরোগের প্রথম প্রাদূর্ভাব লক্ষ করা যায় ১৯৮৮ সালে। এ রোগ আক্রান্ত মাছের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতরোগের সুনির্দিষ্ট রোগজীবাণু নিয়ে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন এ্যাফানোমাইসেস (Aphanomyces) নামক এক প্রকার ছত্রাক জলজ পরিবেশের বিশেষ অবনতিতে এ রোগ সৃষ্টি করে। আবার অনেকে মনে করেন প্রথম পর্যায়ে ভাইরাস এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাকটোরিয়া সংক্রমণে এ রোগ সৃষ্টি হয়। চাষযোগ্য সব মাছেই এ রোগের প্রাদূর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে জিওল মাছ যথা- শোল, টাকি, গজার এবং ছোট মাছ যথা- পুঁটি, মেনি, টেংরা ইত্যাদিতে এ রোগের অধিক সংক্রমণ ঘটে

থাকে। কম তাপমাত্রায় ও জলাশয়ের বিরূপ পরিবেশে এ রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা দেয়। পানির গুণাবলীর নিম্নরূপ পরিবর্তনে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে যেমন- P^H এর কমতি (৪-৬), ক্ষারত্ব হ্রাস পাওয়া (৬৫-৭৫ ppm), তাপমাত্রা কমে যাওয়া (৭-১৯° সেলসিয়াস), ক্লোরাইডের ঘাটতি (৬-৭.৫ ppm)

রোগের লক্ষণ :

- প্রাথমিকভাবে মাছের গায়ে লাল দাগ দেখা যায় এবং পরবর্তিতে উক্ত স্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- মাছ খুব দূর্বল হয় ও ভারসাম্যহীনভাবে পানির উপর ভেসে থাকে। নিষ্ক্রিয়ভাবে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে।
- আক্রান্ত মাছ খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়।
- আক্রান্ত স্থানে ঘা হয় এবং ঘা থেকে পুঁজ ও তীব্র দুর্গন্ধ বের হয়।
- মারাত্মক আক্রান্ত মাছের লেজ ও পাখনা খসে পড়ে।
- মাছের চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং আক্রান্ত মাছ ১০-১৫ দিনের মধ্যে মারা যায়।

চিত্র ৪.২.৪ : মাছের ক্ষতরোগ

প্রতিকার/চিকিৎসা :

ক্ষতরোগ প্রতিকার করার চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি করা শ্রেয়। প্রতিকার করার একটি অসুবিধা হলো এ্যাফানোমাইসেস ছত্রাকটি কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে বিধায় কোন ঔষধ প্রয়োগ করলে ক্ষতের উপরিভাগে অবস্থিত ছত্রাকগুলো মারা গেলেও ভিতরের গুলো সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় এবং পরবর্তিতে আবার ক্ষতের সৃষ্টি করে।

- শীতের আগমনের আগেই পুকুরে ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন দিতে হবে। অনেকেই চুনের সাথে সমান অনুপাতে লবণ দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সেই হিসেবে চুনের সাথে ১ কেজি/শতাংশ লবণ পানিতে গুলিয়ে তা সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়।
- আক্রান্ত মূল্যবান মাছকে (যেমন- ব্রুড হিসেবে ব্যবহার করা হবে এমন মাছ) ৫ ppm পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ ঘন্টা গোসল করালে উপকার পাওয়া যায়।
- আক্রমণকারী ছত্রাক মারার জন্য আক্রান্ত মাছকে ০.৫-১.০ ppm ম্যালাকাইট গ্রীন দ্রবণে ৫-১০ মিনিট ডুবালে প্রতিকার পাওয়া যায়। ম্যালাকাইট গ্রীন আক্রান্ত পুকুরেও প্রয়োগ করা যায়। সেক্ষেত্রে মাত্রা হল ০.১৫-০.২০ ppm.
- ক্ষত সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মারার জন্য খাবারের সাথে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। সাধারণত অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা টেরামাইসিন প্রতি কেজি মাছের জন্য ৭৫-১০০ মি.গ্রা প্রত্যহ খাবারের সাথে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর্যন্ত খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা একই সঙ্গে চালাতে হবে।
- জৈব সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হবে।
- পুকুর আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- পুকুরে বন্যার পানি প্রবেশ রোধ করতে হবে।

ভাইরাসজনিত রোগঃ

(১) স্প্রিং ভাইরেমিয়া (Spring Viraemia)

এই রোগটি এস.ভি.সি (S.V.C = Spring Viraemia of Carp) নামে পরিচিত। এ রোগে মাছের ফুৎকা (swim bladder) প্রদাহ (Inflammation) হয় বিধায় একে Swim Bladder Inflammation (SBI)) নামেও ডাকা হয়।

কারণ/রোগজীবাণু : *Rhabdovirus carpio* নামক ভাইরাসের সংক্রমণে এই রোগ সৃষ্টি হয়।

রোগের বিস্তার : বিভিন্ন প্রজাতির মাছে রোগটি দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, ক্রুসিয়ান কার্প, বিগহেড কার্প, কমনকার্প/কার্পিও এবং বিভিন্ন ধরনের অরনামেন্টাল (Ornamental) মাছ। তবে রোগটি কার্পিও মাছের জন্য বিরাট হুমকি। এই রোগ কার্পিও মাছের জীবনচক্রের সব দশাতেই সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। পরীক্ষামূলকভাবে অন্যান্য প্রজাতি যেমন-নর্দান পাইক (Northern pike), গাপ্পি (Guppy), জেব্রামাছ (Zebrafish) এবং পাম্পকিনসিড

(Pumpkinseed) মাছে রোগটির সংক্রামণ দেখা গেছে। এটি একটি সংক্রামক রোগ। এই রোগের ভাইরাস আক্রান্ত মাছের মল এবং মূত্রের সাথে পানিতে অবমুক্ত হয় এবং অন্য মাছেও ছড়িয়ে পড়ে। এস.ভি.সি রোগে আক্রান্ত মাছ প্রজননে ব্যবহার করা হলে উৎপাদিত পোনা মাছেও এই রোগের সংক্রমণ ঘটে।

এ রোগে আক্রান্ত মাছ নিরাময় হলে দ্বিতীয় বার আর এই রোগে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু দেহে সারাজীবন এই ভাইরাস বহন করে চলে। এক্ষেত্রে ভাইরাস উক্ত মাছের দেহে সুপ্তাবস্থায় থাকে এবং মাছকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করে। অনুকূল পরিবেশে র‍্যাবডোভাইরাস পোষাক মাছের দেহ থেকে বের হয়ে অন্যান্য মাছে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। সাধারণত বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মের শুরুতে এই রোগের প্রকোপ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

রোগের লক্ষণ :

- আক্রান্ত মাছের দেহ কালচে বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত মাছের দেহে রক্তক্ষরণ হয়।
- ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয় এবং ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে।
- আক্রান্ত মাছের দেহ গহ্বরে ঘন তরল পদার্থ জমা হয় এবং পেট ফুলে যায়।
- মাছের পায়ুপথে প্রদাহ হয় এবং চোখ ফুলে যায় এবং বাইরের দিকে বের হয়ে আসে।
- মাছের অন্ত্র এবং ফুৎকায় রক্তক্ষরণ হয়।
- মাছ দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত মাছ পানি নির্গমনের (outlet) স্থানে জড়ো হয়।

চিত্র ৪.২.৫ : স্প্রিং ভাইরেমিয়া রোগে আক্রান্ত মাছ

প্রতিকার/চিকিৎসা :- বর্তমানে এ রোগের কোনো চিকিৎসা বের হয়নি।

- মাছ একবার আক্রান্ত হয়ে গেলে আর কোন চিকিৎসা নেই তাই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়াই উত্তম।
- পানির তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াম/৬৮° ফারেনহাইট এর উপরে রাখলে এ রোগের প্রাদূর্ভাব কমানো/থামানো যেতে পারে।
- পানিকে এবং মাছ চাষে ব্যবহৃত উপকরণকে UV treatment করে এই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- এছাড়া পানির পরিবেশ দূষণমুক্ত রেখে এবং মাছ চাষে উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে এই রোগের ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকা যায়।

র‍্যাবডোভাইরাস রোগ (Rhabdovirus disease) :

- কারণ/রোগজীবাণু: র‍্যাবডোভাইরাস প্রজাতি (*Rhabdovirus* SP)

রোগের বিস্তার : এই রোগ প্রধানত গ্রাসকার্পে সংক্রামিত হতে দেখা যায়। রোগের বিস্তারের ধরণ ও কার্যকারণ স্প্রিং ভাইরেমিয়ার অনুরূপ। জলজ পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীর ব্যাপক ওঠা-নামায় এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এটিও সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত মাছে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দেয়।

রোগের লক্ষণ :

এই রোগের লক্ষণ এস.ভি.সি-এর প্রায় অনুরূপ। প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো হলো-

- পায়ুপথে প্রদাহ ও রক্তক্ষরণ হয় এবং আঁইশের গোড়ায় রক্তক্ষরণ হয়।
- পাখনা ছিড়ে যায় ও পচন ধরে এবং পরিপাক নালীতে প্রদাহ হয়।

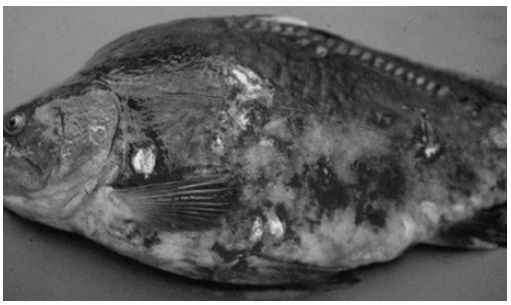

চিত্র ৪.২.৬ : র‍্যাবডোভাইরাস রোগে আক্রান্ত মাছ

- দেহগহ্বরে রক্তাভ ঘন তরল জমা হয় ও পেট ফুলে যায়।
- চোখ বাইরের দিকে বের হয়ে আসে।

প্রতিকার/চিকিৎসা :
ভাইরাসজনিত রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করার জন্য মৎস্য বিজ্ঞানীরা নিরালস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ অবধি যুৎসই কোন উপায় বের করা সম্ভব হয়নি। সেজন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে, সংক্রমণ ঠেকানোর ব্যবস্থা নিয়ে, রোগের প্রতি সংবেদনশীলতা কমানোর জন্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে টিকা (Vaccine) দিয়ে মাছের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা হয়। একবার ভাইরাস সংক্রমণ হয়ে গেলে আর কোন উপায় থাকে না বিধায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উত্তম।

- পানির তাপমাত্রা ২০°C এর উপরে রেখে এ রোগের সংক্রমণ থামানো যায়।
- পানিকে UV ট্রিটমেন্ট করে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- র‍্যাবডোভাইরাস আক্রান্ত মাছের পোনা ও ডিম ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

পরজীবীঘটিত রোগ :

(১) সাদা দাগ রোগ (Ichthyophthiriasis)

কারণ/রোগজীবাণু : *Ichthyophthirius multifiliis* নামের এককোষী প্রোটোজোয়ান (Protozoan) বহিঃপরজীবী (ectoparasite) এ রোগ সৃষ্টি করে। এটি Freshwater white spot disease অথবা Freshwater ich নামেও পরিচিত।

রোগের বিস্তার : এটি স্বাদুপানির মাছের একটি খুবই সাধারণ (common) এবং পুনঃপুন ঘটনশীল (persistent) রোগ। চাষোপযোগী মাছের জন্য খুবই অনিষ্টকারী রোগ এটি। দেশী কার্পজাতীয় মাছে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। চীনা কার্পেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে। তেলাপিয়া এবং গোল্ডফিশেও এ রোগ দেখা যায়। আঙ্গুলে পোনার ক্ষেত্রে এ রোগের সংক্রমণের তীব্রতা বেশি হয়। এর সংক্রমণ ও তীব্রতার মাত্রা ২৫°-২৬°C তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মে ও বসন্তে সাদা দাগ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পুকুরে মাছের অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেনের স্বল্পতা, রাসায়নিক দূষণ এবং উচ্চ তাপমাত্রা রোগটির প্রাদুর্ভাব (outbreak) কে তরান্বিত করে।

রোগের লক্ষণ :

- আক্রান্ত মাছের ত্বক, পাখনা এবং কানকোয় বিন্দুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ফোটা দেখা দেয়।
- রোগের তীব্রতা খুব বেশি হলে মাছের ত্বক সাদা ঝিল্লীতে ঢাকা পড়ে যায়।
- মাছের গায়ের পিচ্ছিল আবরণ (mucus) কমে যায় এবং স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারায়।
- পরজীবী সংক্রামণের শুরুতে মাছ পানিতে লাফালাফি শুরু করে এবং শক্ত কোন কিছুতে গা ঘষতে থাকে।
- আক্রান্ত মাছের পাখনা মুড়িয়ে যায়।
- মাছ অলসভাবে চলাফেরা করে এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়।
- আক্রান্ত মাছ বহি:প্রণোদনে (external stimuli) ধীরগতিতে বা দেরীতে সাড়া দেয়।
- পানির উপরিভাগে দীর্ঘ সময় অলসভাবে ভেসে থাকে।

প্রতিকার/চিকিৎসা : নিম্নলিখিত তিনভাবে সাদা দাগ রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা এবং চিকিৎসা করা যায়:-

(i) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা (Proper management)

* পুকুরে অধিক ঘনত্বে মাছ মজুদ করা বন্ধ করতে হবে।
* পুকুরে নিয়মিত পানি পরিবর্তন করতে হবে এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন এর অনুকূল মাত্রা বজায় রাখতে হবে।
* পুকুর বন্যামুক্ত রাখতে হবে এবং বাহির থেকে অবাঞ্চিত মাছ ও পাখি/প্রাণির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
* পুকুর বা জলাশয় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
* পুকুরে নিয়মিত বিরতিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

(ii) ভৌত পদ্ধতি (Physical method) : এই পদ্ধতিতে মূলত পরজীবীর জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ (phase) ভেঙ্গে দিয়ে রোগের প্রতিকার করা হয়।

* **প্রধানত:** হ্যাচারি বা ট্যাংকের ছিদ্রযুক্ত কন্টেইনারে (container) রাখা মাছের উপর পানির ফ্লাশ দিয়ে সাদা দাগ রোগের পরজীবীকে দূর করা যায়।

* অ্যাকুরিয়ামে শোভাবর্ধনকারী মাছ এবং জিয়ল মাছের ক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করেও (৩০-৩২$^{\circ}$C) এ রোগের পরজীবীকে দমন করা যায়। কারণ পরজীবীটির জীবন চক্র পানির তাপমাত্রার উপর খুবই নির্ভরশীল জীবন চক্র সম্পন্ন হতে ২৫$^{\circ}$C তাপমাত্রায় ৭ দিন এবং ৬$^{\circ}$C তাপমাত্রায় ৮ সপ্তাহ সময় লাগে। কাজেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এদের জীবন চক্রের ধাপগুলোকে ধ্বংস করা যায়।

(iii) রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical method) : সাদা দাগ রোগের পরজীবীর জীবন চক্রের দুটি ধাপ বা পর্যায় হলো- Theront এবং Tomont এই দুই পর্যায়ে এরা মুক্ত সাঁতারু (Free swimming phase)। আর রাসায়নিক প্রয়োগ করে ধ্বংস করার সবচেয়ে উপযুক্ত হলো এই দুটি পর্যায়।

- অ্যাকুরিয়ামের আক্রান্ত মাছকে ১.৫-২.৫% সাধারণ লবণ (NaCl) দ্রবণে ১০ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখতে হবে। এভাবে এক সপ্তাহ চালালে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
- পুকুরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ২ থেকে ৫ ppm পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। অ্যাকুরিয়ামের ক্ষেত্রে ১৫ ppm $KMnO_4$ দ্রবণে আক্রান্ত মাছ যতক্ষণ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হবে।
- পুকুরে ১৫-২৫ ppm হারে ফরমালিন ব্যবহার করেও এই পরজীবীর আক্রমণ থেকে মাছকে রক্ষা করা যায়।
- ৩ থেকে ৪ দিন বিরতিতে পুকুরে ০.১ ppm হারে ম্যালাকাইট গ্রীন স্প্রে করে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ এর জিংক-মুক্ত অক্সালেট (Zinc-free Oxalate) চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করে চামড়ায় থাকা পরজীবীকে মেরে ফেলতে পারে।
- ১০ ppm Acriflavin অথবা Acriflavin hydrochloride দ্রবনে দীর্ঘ সময় ধরে গোসল করালে ভাল ফল পাওয়ার আশা করা যায়। এভাবে ৩ থেকে ২০ দিন গোসল করাতে হবে।
- মিথিলীন ব্লু ২ থেকে ৩ ppm হারে প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়। এটি সরাসরি অ্যাকুরিয়ামের পানিতে প্রয়োগ করেও উপকার পাওয়া যায়।

(২) মাছের উকুন (Argulosis) :

এই রোগ সাধারণভাবে মাছের উকুন নামে পরিচিত।

- **কারণ/রোগজীবাণু:** আরগুলাস গণের কয়েক প্রজাতির পরজীবী এই রোগ সৃষ্টি করে। যথা- *Argulus foliaceus*, *Argulus coregoni*.

রোগের বিস্তার : বহুকোষী পরজীবীঘটিত রোগের মধ্যে আরগুলোসিস মাছের প্রধান রোগ। কার্পজাতীয় মাছের দেশী ও বিদেশী সব প্রজাতিতেই এ রোগের সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাছাড়া স্যামন, ট্রাউটসহ অন্যান্য অনেক প্রজাতির মাছেই আরগুলাস সংক্রমণ দেখা যায়। এমনকি ব্যাঙেও সংক্রামিত হয়। পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। পরজীবী সংক্রমণের মাত্রা কম হলে মাছের খুব বেশি ক্ষতি হয় না। এ রোগে অনেক সময় পরিপক্ক ও প্রজননক্ষম মাছের ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। পুকুরের পরিবেশ খারাপ হলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পুকুর পুরানো হলে এবং পচা কাদা বেশি থাকলে এ পরজীবীর সংক্রমণের মাত্রা ও তীব্রতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। মাছের জীবন চক্রের সব দশাতেই এ পরজীবীর সংক্রমণ ঘটে থাকে। এই পরজীবী খালি চোখে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ :

- মাছ বিচলিত হয়ে দ্রুত ও অবিশ্রান্তভাবে সাঁতার কাটতে থাকে।
- মাছের গায়ে পরজীবী আটকে থাকে।
- মাছ পরজীবীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য শক্ত কিছুতে গা ঘষতে থাকে।
- আক্রান্ত স্থলের চারপাশে লালচে বর্ণ ধারণ করে।
- আক্রান্ত স্থানে ঘা সৃষ্টি হয় ও রক্তক্ষরণ হয়।

- মাছের দেহ ক্ষীণ হয়ে যায় ও বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
- মাছ অস্থিরভাবে লাফালাফি করতে থাকে।

প্রতিকার/চিকিৎসা :

মাছের পরজীবী অনেক থাকলেও বাংলাদেশে পরজীবীজনিত রোগের প্রাদূর্ভাব তেমন প্রকট নয়। চিংড়ির ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই বললেই চলে। যে সকল পরজীবীজনিত রোগ মৎস্যচাষে সমস্যা করে তার অধিকাংশই বহি:পরজীবীর আক্রমণে হয়। এগুলোর মধ্যে এককোষী পরজীবী এবং কিছু বহুকোষী পরজীবীর আক্রমণজনিত রোগই প্রধান। নিম্নে আরগুলাস দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রতিকার পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো-

- যেহেতু এরা পোকামাকড় জাতীয় পরজীবীঘটিত রোগ সেহেতু এর চিকিৎসার জন্য কীটনাশক (Insecticide) ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- ডিপটারেক্স : ০.৩-০.৫ ppm হারে প্রতি সপ্তাহে ১ বার করে দু'সপ্তাহ পর্যন্ত।
- সুমিথিওন/ম্যালাথিওন/প্যারাথিওন: ০.২৫-০.৩ ppm হারে পুকুরে প্রয়োগ সপ্তাহে ১ বার দু'সপ্তাহ পর্যন্ত।
- Lice-Solve নামক একধরনের ঔষধ পাওয়া যায় যা সরাসরি পুকুর কিংবা ট্যাংকের পানিতে প্রয়োগ করে আরগুলাস মারা যায়।
- আরগুলাস আক্রান্ত পুকুরে ঔষধটি ব্যবহার করার সময় পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের অনুকূল মাত্রা বজায় রাখতে হবে।
- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিয়ম করে পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে, জৈব সারের প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে এবং পুকুরের তলার পচা কাদা তুলে ফেলতে হবে।

(৩) কৃমিরোগ (Fluke Disease):

কৃমি হলো বহুকোষী পরজীবী। কৃমিজাতীয় পরজীবী মাছের অন্তঃ এবং বহিঃপরজীবী হিসেবে রোগ সৃষ্টি করে। কৃমিজাতীয় রোগের মধ্যে নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ চাষযোগ্য মাছের জন্য ক্ষতিকর:-

(ক) ড্যাকটাইলোগাইরোসিস (Dactylogyrosis/Gill Fluke)
(খ) গাইরোড্যাকটাইলোসিস (Gyrodactylosis/Skin Fluke)

নিম্নে এদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

(ক) ড্যাকটাইলোগাইরোসিস : এই রোগ ফুলকা কৃমি রোগ (Gill Fluke Disease) নামে পরিচিত।

*** রোগজীবাণু/কারণ :** ড্যাকটাইলোগাইভহ (*Dactylogyrus*) গণের কয়েকটি প্রজাতি এই রোগের সৃষ্টি করে। যথা-
Dactylogyrus lamellatus
D. *anchoratus*
D. *vastator* ইত্যাদি

রোগের বিস্তার : স্বাদু পানি এবং সামুদ্রিক পানির অধিকাংশ মাছই এই রোগের প্রতি সংবেদনশীল। এ রোগে প্রধানত মাছের ফুলকা আক্রান্ত হয়। কার্পজাতীয় মাছের ৪-৫ গ্রাম ওজনের পোনা মাছে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। সংক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ব্যাপক হারে মড়ক দেখা দেয়। বসন্তের শেষে এবং গ্রীষ্মের শুরুতে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পানির তাপমাত্রা ২০-২৫° C এর মধ্যে এ রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটে।

রোগের লক্ষণ :

- আক্রান্ত মাছ অস্থিরভাবে চলাফেরা করে এবং পানি নির্গমনের নালার কাছে জড়ো হয়।
- ফুলকা ফুলে যায় এবং ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়।
- ফুলকা ও দেহের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
- কানকো (operculum) খোলা থাকে।
- মাছের দেহে অধিক মিউকাস (mucus) সৃষ্টি হয়
- মাছের রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।
- মাছ দূর্বল হয়ে যায়

রোগের লক্ষণ :

- আক্রান্ত মাছ ছটফট করতে থাকে ও দ্রুত সাঁতার কাটতে থাকে।
- পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শক্ত কিছুতে গা ঘষতে থাকে।
- মারাত্মক আক্রান্ত মাছের চোখ ঘোলা হয়ে যায় এবং মাছ অন্ধ হয়ে যায়।
- আঁইশ ফুলে যায় এবং লালচে বর্ণ ধারণ করে।
- আক্রান্ত মাছের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য থাকে না।
- মাছের বর্ণ ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
- ক্ষতস্থানে ছত্রাক বা ব্যাকটোরিয়া সহজেই সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

কৃমিরোগের প্রতিকার/চিকিৎসা :

- কৃমরোগের প্রতিকার নিম্নোক্তভাবে করা যায়-
- সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ (NaCl) দিয়ে : ২.৫% লবণ দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ১ ঘন্টা গোসল করাতে হবে।
- মেবেনডাজল (Mebendazole) দিয়ে : ১ মিগ্রা/লিটার হারে দ্রবণ তৈরি করে মাছকে ২৪ ঘন্টা গোসল করালে যেকোনো কৃমি দূর হয়।
- এসেটিক এসিড (Acetic acid) দিয়ে : এক লিটার পানিতে ১-২ মি.লি. গ্ল্যাসিয়াল এসেটিক এসিড মিশিয়ে তাতে আক্রান্ত মাছকে ১-১০ মিনিট গোসল করালে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- ফরমালিন (Formalin) দিয়ে : ২৫০-৩৩০ মি.গ্রা/লিটার ফরমালিন দ্রবণ প্রস্তুত করে আক্রান্ত মাছকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত গোসল করালে সুফল পাওয়া যায়। একই সাথে নিম্নের প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে–
- পুকুর বা জলাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং নিয়মিত চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- মাছকে প্রয়োজনমত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- পুকুর বা জলাশয়ে যাতে বাহির থেকে কোনো অবাঞ্চিত মাছ/প্রাণি প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পুকুর শামুক/ঝিনুক জন্মাতে দেওয়া যাবে না।
- হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের জন্য কৃমিমুক্ত ব্রুডমাছ ব্যবহার করতে হবে।

অপুষ্টিজনিত রোগ : মাছের অপুষ্টিজনিত রোগগুলো সাধারণত ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। বিশেষ কোনো খাদ্য উপাদানের অভাবে মাছ অপুষ্টিতে ভুগতে পারে এবং বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। এতে মাছের বৃদ্ধির হার কমে যায়।

(১) প্রোটিনের অভাবজনিত রোগঃ

কারণ : মৎস্য খাদ্যে প্রোটিন বা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের স্বল্পতা।

লক্ষণ :

মাছের বর্ধন ব্যহত হয়। এনজাইম ও হরমোনের জৈব-সংশ্লেষণ ব্যহত হয়। মাছের বৃক্কে (Kidney) অস্বাভাবিক ক্যালশিয়াম জমা হতে পারে। একে রেনাল ক্যালশিনোসিস বলা হয়। পৃষ্ঠ পাখনায় ক্ষত দেখা দিতে পারে। চোখে ছানি পড়ে মাছ অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

প্রতিকার :

- মাছকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সহজপাচ্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- খাদ্যে যথাযথ মাত্রায় লাইসিন যোগ করে পৃষ্ঠ পাখনার ক্ষত হতে প্রতিকার পাওয়া যায়।
- মিথিওনিন ও ট্রিপটোফেন নামক অ্যামাইনো এসিড খাদ্যে যথাযথ মাত্রায় ব্যবহার করলে চোখে ছানি পড়ে না।

(২) লিপিডের অভাবজনিত রোগ :

কারণ : মৎস্য খাদ্যে লিপিড বা চর্বির স্বল্পতা।

লক্ষণ :

মাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। মাছের রক্ত শূণ্যতা দেখা দেয় এবং মাছ দূর্বল হয়ে পড়ে। মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়, পুচ্ছ পাখনা ভেঙ্গে যায় এবং যকৃত ফ্যাকাশে হয় এবং ফুলে যায়।

প্রতিকার :

মাছের খাদ্য তৈরিতে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়ে লিপিডের অভাবজনিত রোগ থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়। তাছাড়া সরিষা, তিল ইত্যাদির খৈল খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৩) ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ :

কারণ : মৎস্য খাদ্যে বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে নানা ধরনের সমস্যা হয়।

লক্ষণ :

- ভিটামিন-A এর অভাবে মাছের চোখ ফুলে যায় এবং দীর্ঘকাল এভাবে চলতে থাকলে মাছ অন্ধ হয়ে যায়।
- ভিটামিন-D এর অভাবে বৃক্কে (Kidney) সমস্যা দেখা দেয় এবং রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়। মাছের অস্থি ও কাটায় সমস্যা দেখা দেয়।
- ভিটামিন-E এর অভাবে মাছের মাংসপেশীতে সমস্যা দেখা দেয় এবং লোহিত রক্তকনিকা ভেঙ্গে যায়। মাছের দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়। এই ভিটামিনের অভাবে মাছের প্রজনন ব্যহত হতে পারে।
- ভিটামিন-K এর অভাবে মাংসপেশীতে রক্তক্ষরণ ঘটে এবং ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধতে অধিক সময় লাগে।
- ভিটামিন-B complex এর অভাবে মূলত মাছের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিক সমস্যা দেখা দেয়, যার ফলে ক্ষুধামন্দা, দৃষ্টি শক্তি হ্রাস, দূর্বলতা ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে।
- ভিটামিন -C বা এসকরবিক এসিডের অভাবে মাছের ক্ষতস্থান শুকাতে দেরি হয় এবং অস্থি ও কাটায় অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় ।

প্রতিকার : ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে যে নির্দিষ্ট ভিটামিন সমস্যার জন্য দায়ী সেই ভিটামিন সহযোগে সুষম খাদ্য তৈরী করে তা নিয়মিতভাবে মাছকে খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে ভিটামিনের সঠিক মাত্রা মেনে চলতে হবে যা নিচের টেবিলে দেওয়া হলো।

Vitamin (mg/kg dry diet)	কার্পজাতীয় মাছের জন্য
ভিটামিন-A	১০০০-২০০০ IU
ভিটামিন-D	২৪০০ IU
ভিটামিন-E	৮০-১০০
ভিটামিন-K	এখনও সঠিক মাত্রা নির্ধারিত হয়নি।
ভিটামিন-B_1 (থায়ামিন)	২-৩
ভিটামিন-B_2 (রিবোফলাবিন)	৭-১০
ভিটামিন-B_3 (নিয়াসিন)	৩০-৫০
ভিটামিন-B_5 পেন্টোথেনিক এসিড)	৩০-৪০
ভিটামিন-C	৩০-৫০

[Ref. FAO corporate document repository]

(৪) খনিজ লবণের অভাবজনিত রোগ :

কারণ : খাদ্যে খনিজ লবণের স্বল্পতা।

লক্ষণ : ক্যালসিয়ামের অভাবে মাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, হাড় ও কঙ্কালের গঠন বাধাগ্রস্থ হয়।

- ফসফরাসের অভাবে মাছের অস্থির গঠন বাধাগ্রস্থ হয় এবং বিপাক ক্রিয়া ব্যহত হয়।
- খাদ্যে আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা হ্রাস পায় ফলে গলগন্ড রোগ দেখা দেয়।
- জিঙ্কের অভাবে মাছের চোখে ছানি পড়ে।

- লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

প্রতিকার : মৎস্য খাদ্যে নিম্নোক্ত মাত্রায় খনিজ লবণ যোগ করে সমস্যার সমাধান করা যায়।

খনিজ লবণ	পরিমাণ (মাত্রা)/কেজি শুস্ক খাদ্য
ক্যালসিয়াম-(Calcium)	৫ গ্রাম
ফসফরাস-(Phosphorus)	৭ গ্রাম
আয়োডিন-(Iodine)	১০০-৩০০ মিগ্রা
লৌহ-(Iron)	৫০-১০০ মিগ্রা
জিঙ্ক- (Zinc)	৩০-১০০ মিগ্রা

[Ref. FAO corporate document repository]

মাছের রোগ প্রতিরোধের উপায় (Prevention of fish diseases):

মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি সাধারণ মূলনীতি প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে-রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। পানিতে বসবাস করে বিধায় মাছের বিভিন্ন কর্মকান্ড, আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করা কষ্টসাধ্য। একারণে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় করা এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করা অধিকতর কষ্টসাধ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রোগ হওয়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম। এখানে মাছের রোগ প্রতিরোধের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো-

(১) পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ : পানির বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর অনুকূল মাত্রা বজায় রাখার মাধ্যমে মাছকে বাসযোগ্য পরিবেশ দেওয়া যায়। এর ফলে পরিবেশগত ধকল থেকে মাছ রক্ষা পায় এবং সুস্থ থাকে।

(২) মজুদ ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য প্রয়োগ : সঠিক সংখ্যায় পোনা মজুদ, পরিমিত সার প্রয়োগ ও সুষম খাদ্য সরবরাহ করে মাছকে রোগ হওয়া থেকে মুক্ত রাখা যায়।

(৩) পুকুর জীবাণুমুক্তকরণ : পুকুর শুকিয়ে এবং পুকুরে রাসায়নিক পদার্থ (চুন, কীটনাশক প্রভৃতি) প্রয়োগের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করে সফলভাবে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(৪) উপকরণ জীবাণুমুক্তকরণ : মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ যেমন-পোনা পরিবহন পাত্র, হাপা, খাদ্য প্রদানের পাত্র, জাল ইত্যাদি বিভিন্ন রোগজীবাণু ও পরজীবীর বাহক হিসেবে কাজ করে। ব্যবহারের পূর্বে এসব উপকরণ জীবাণুমুক্ত করে নিলে মাছের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

(৫) বিভিন্ন বয়সের মাছ পৃথকভাবে লালন-পালন : অনেক সময় প্রজননক্ষম এবং বয়স্ক মাছ অনেক রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। ঐসব রোগ অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মাছে সংক্রমণ ঘটায়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মাছকে আলাদাভাবে লালন পালন করে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(৬) মরা বা রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু মাছ অপসারণ : রোগাক্রান্ত মরা মাছে রোগজীবাণু দ্রুত বংশ বিস্তার করে। তাই মরা ও রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু মাছ পুকুর থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব অপসারণ করে রোগ সংক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করা যায়।

(৭) রাসায়নিক প্রতিরোধ : মাছকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন- এন্টিবায়োটিক) খাইয়ে, রাসায়নিক দ্রবণে মাছকে ডুবিয়ে রেখে বা পুকুরে প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

(৮) শরীরবৃত্তীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি : কৃত্রিমভাবে শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) শক্তিশালী করে মাছের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেমন-ভ্যাকসিন (vaccinc) দিয়ে মাছের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

(৯) সংগনিরোধ : দূরবর্তী ভিন্ন কোন জলাশয় বা ভিন্ন দেশের কোন মাছ মজুদ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংক্রমণ রোধ করার লক্ষ্যে উক্ত মাছকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগনিরোধ ব্যবস্থায় রাখতে হবে। এটি মাছের রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকার মাছের রোগের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

সুস্থ্য মাছ স্বাভাবিক জীবন নির্বাহ করতে পারে কিন্তু রোগাক্রান্ত মাছ তা পারে না। রোগাক্রান্ত হলে মাছ অনেকগুলো আচরণগত অসংগতি দেখায়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ছত্রাক পরজীবী ছাড়াও বিভিন্ন পুষ্টি ও অপুষ্টিজনিত কারনে মাছে রোগ হতে পারে। রোগাক্রান্ত মাছের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। তবে মাছের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়াই উত্তম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষন নয়?
(ক) স্বাভাবিক খাবার খাবে (খ) অস্বাভাবিক মিউকাস নির্গত হবে
(গ) ভারসাম্য হীন ভাবে সাঁতার কাটবে (ঘ) খাদ্যের প্রতি অনীহা দেখাবে

২। কোন রোগে মৃত্যুহার অনেক বেশি হয়?
(ক) ছত্রাকজনিত রোগ (খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ
(গ) ভাইরাসজনিত রোগ (ঘ) পরজীবীঘটিত রোগ

৩। কোনটির আক্রমনে মাছের সাদা দাগ রোগ হয়?
(ক) পরজীবী (খ) ভাইরাস
(গ) ব্যাকটেরিয়া (ঘ) ছত্রাক

উদ্দীপক:
নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
লিটনের পুকুরের পানি পরিষ্কার এবং পানিতে কোন জলজ আগাছাও নেই। তিনি দেখলেন কিছু মাছ অস্থিরভাবে লাফালাফি করছে এবং পুকুরে পুঁতে রাখা বাঁশের সাথে গা ঘষাঘষি করছে।

৪। লিটনের পুকুরের মাছের গা ঘষাঘষির কারন কী?
(ক) ছত্রাক (খ) আরগুলাস
(গ) ব্যাকটেরিয়া (ঘ) ভাইরাস

৫। লিটনের পুকুরের মাছের সমস্যা সমাধানের উপায় কোনটি?
i. ডিপটারেক্স প্রয়োগ
ii. চুন প্রয়োগ
iii. পুকুরে জৈব সার প্রয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ চিংড়ির রোগ ও ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চিংড়ির রোগের কারণ ও সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- চিংড়ি বিভিন্ন প্রকার রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

	মুখ্য শব্দ	গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, হোয়াইট স্পট, সংগনিরোধ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশে চিংড়ির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিদিন প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করি তার প্রায় ৬০% যোগান দেয় মাছ ও চিংড়ি। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যে হিমায়িত চিংড়ির পরিমাণ ছিল ৫৩% এবং এসব পণ্য রপ্তানিবাবদ অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় ৮৫% এসেছিল চিংড়ি থেকে। বাংলাদেশের চিংড়ি উৎপাদনের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে শুরু করে পরবর্তি বছরগুলোতে চাষকৃত চিংড়ির পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েছে। চিংড়ি চাষের পরিধি বৃদ্ধি এবং প্রচলিত সনাতন চাষ পদ্ধতি থেকে আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ক্রমোন্নতি-ই এর প্রধান কারণ। সনাতন চাষ পদ্ধতিতে প্রথমদিকে তেমন রোগ বালাই ছিল না বা চিংড়ি চাষীরা এ ব্যাপারে তেমন সচেতন ছিলেন না। তবে চিংড়ি চাষে নিবিড়তা বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রোগবালাই ও আপদ বাড়তে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাগদা চিংড়ি চাষে হোয়াইট স্পট বা চায়না ভাইরাস রোগ মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। চিংড়ি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার পাশাপাশি রোগবালাই সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞান থাকলে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে চিংড়িকে সুস্থ-সবল রেখে ভালো ফলন নিশ্চিত করা সম্ভব।

রোগের কারণ

চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। এর মধ্যে চিহ্নিত কারণগুলো নিম্নরূপ-

১. পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুণের অবনতি (পানির তাপমাত্রা, জৈব তলানি, পিএইচ, লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, শেওলা)।
২. মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার (সার, খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি)।
৩. বাইরের এলাকা বা পার্শ্ববর্তী রোগাক্রান্ত খামারের দূষিত পানির প্রবেশ।
৪. অধিক মজুদ ঘনত্ব।
৫. রোগমুক্ত/ SPF পোনা ব্যবহার না করা।
৬. অপুষ্টি।
৭. ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ও হ্যান্ডেলিং।
৮. পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ।
৯. আক্রান্ত খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথভাবে পরিস্কার না করেই পুনরায় ব্যবহার।

চিংড়ির রোগের সাধারণ লক্ষণ

জীবাণুর আক্রমন ও রোগের ধরণ অনুযায়ী রোগাক্রান্ত চিংড়ির মাঝে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত লক্ষণ সমূহ দেখা যায়:

- অসুস্থ চিংড়িকে পুকুরের পাড়ের কাছে অচেতন অবস্থায় দেখা যাবে।
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখাবে এবং অসুস্থ্য চিংড়ির খাদ্যনালী খালি থাকবে।

- রোগাক্রান্ত চিংড়ির ফুলকায় কাল, হলুদ বা বাদামী দাগ অথবা ক্যারাপেস (Carapace)এবং খোলসে সাদা সাদা দাগ দেখা যাবে।
- রোগের কারণে চিংড়ির উপাঙ্গে পচন ধরতে পারে।
- অসুস্থ চিংড়ির খোলসের উপর শেওলা জমতে দেখা যায়।
- অসুস্থ চিংড়ির খোলস নরম থাকে এবং পেশী সাদা বা হলদে হতে দেখা যায়।

চিংড়ির রোগ

(১) হোয়াইট স্পট বা সাদা দাগ রোগ

এটি চিংড়ির মহামারী রোগ কারণ এই রোগে আক্রান্ত চিংড়ির বাঁচার আশা থাকে না। একে White Spot Baculo Virus (WSBV), White spot Syndrome Virus (WSSV) অথবা চায়না ভাইরাস রোগও বলা হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ি এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। গলদা চিংড়ির হোয়াইট স্পট রোগের কোন রিপোর্ট এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। রোগটি ১৯৯৪ সালে কক্সবাজার অঞ্চলে প্রথম দেখা দেয় এবং পরবর্তিতে খুলনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের কারন : ভাইরাসের কারনে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ :

মারাত্মকভাবে আক্রান্ত চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ দ্রুত কমিয়ে দেয়। ভাইরাস আক্রান্ত চিংড়ি প্রাথমিক অবস্থায় দূর্বল হয়ে পড়ে এবং পাড়ের কাছে এসে অলস বসে থাকে। মৃত্যুহার ব্যাপক এবং লক্ষণ প্রকাশ পাবার ৩ থেকে ১০ দিনের ভিতরে শতভাগ চিংড়ি মারা যায়। আক্রান্ত চিংড়ির খোলস ঢিলঢিলে হয়ে যায় এবং ক্যারাপেস ও খোলসে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুমূর্ষু চিংড়ি নীলাভ থেকে লালচে বাদামি বর্ণের হয়ে যায়।

চিকিৎসা/প্রতিকার : তেমন কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নেই। তাই ইচ্ছেমত কোন ঔষধ বা কেমিক্যাল ব্যবহার না করাই ভাল। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই একমাত্র পথ।

(২) ইয়েলোহেড (Yellowhead) বা মস্তক হলুদ হওয়া রোগঃ

এই রোগে আক্রান্ত চিংড়ির মাথা হলুদ হয়ে যায় বিধায় একে ইয়েলোহেড রোগ বলা হয়। সংক্ষেপে একে YHD (Yellowhead Disease) ও বলে। মূলত: বাগদা চিংড়ি এ রোগের শিকার। বাংলাদেশে এ রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব এখনও ঘটেনি।

রোগের কারণ : ভাইরাসের আক্রমণে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণঃ

আক্রান্ত চিংড়ি প্রথমদিকে খাদ্য গ্রহণ করলেও দিন বাড়ার সাথে সাথে খাদ্য গ্রহণ ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়। PL ২০-২৫ থেকে শুরু করে কিশোর বয়সের চিংড়ি এ রোগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। আক্রান্ত চিংড়ি থেকে অন্য চিংড়িতে রোগের সংক্রমণ ঘটে। আক্রান্ত চিংড়ি লক্ষণ প্রকাশ পাবার পর ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে ব্যাপক হারে মারা যায় এবং মৃত্যুহার শতভাগেও পৌঁছাতে পারে। রোগাক্রান্ত চিংড়ির দেহের বর্ণ ফ্যাকাশে হতে শুরু করে। শিরোবক্ষ (Cephalothorax) এবং হেপাটোপ্যানক্রিয়াস (Hepatopancreas) হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং ফুলে যায়।

চিকিৎসা/প্রতিকারঃ

এ রোগের চিকিৎসায় ঔষধে কাজ হয় না। তাই সুষ্ঠু চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করাই একমাত্র পন্থা। তবে চাষের পুকুরে ফাইটোপ্লাংকটন চাষ করে এ রোগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় বলে শুনা যায়।

(৩) কালো/বাদামি দাগ রোগ অথবা খোলসের রোগ (Black/Brown spot or Shell disease)

গলদা চিংড়িতে রোগটি বেশি হলেও বাগদা চিংড়িতে এ রোগ হতে দেখা যায়।

কারণ : বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas*)-এর আক্রমনে এ রোগ হয়।

লক্ষণ : ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে চিংড়ির খোলসে কালো কালো বা বাদামি দাগ সৃষ্টি হয়। খোলসের গায়ে ছিদ্র হয়, খোলস ক্ষতিগ্রস্থ হয়, উপাঙ্গ খসে পড়ে এবং পরবর্তিতে ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চিংড়ি মারা যায়। সব বয়সের চিংড়িই এ রোগের শিকার হতে পারে।

প্রতিকার : FAO এর সুপারিশ মোতাবেক Nifurpurinol নামক এন্টিবায়োটিক দ্বারা এ রোগের চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। তাছাড়া Oxolinic acid ব্যবহারের পরামর্শও দেয়া হয়। তবে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা হলো এ রোগ প্রতিরোধের সব থেকে ভালো পথ।

(৪) ছত্রাক জনিত রোগ

এ রোগের নির্দিষ্ট কোন নাম নেই। যেহেতু ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়, তাই একে ছত্রাকজনিত রোগ বলা হয়। সব বয়সের গলদা ও বাগদা চিংড়িই ছত্রাকের শিকার হতে পারে। তবে চিংড়ির লার্ভা ও পিএল এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ছত্রাক মূলত মাধ্যমিক সংক্রমণ ঘটায়।

রোগের কারণ : *Lagenidium, Fusarium solani* ইত্যাদি ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ : আক্রান্ত চিংড়ির খোলসের ভিতর দিয়ে বিস্তৃত জালের মত ছত্রাক দৃশ্যমান হয়। আক্রান্ত চিংড়ির পেশীকলা হলদে ধুসর বা নীলাভ বর্ণ ধারণ করে।

প্রতিকার : FAO-এর সুপারিশে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে ছত্রাকের আক্রমণ দমন করতে Trifluralin, Merthiolate-ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

(৫) প্রোটোজোয়াজনিত রোগ

এক বা একাধিক প্রোটোজোয়া পরজীবীর আক্রমণে এ রোগ হয়। যে কোন বয়সের গলদা বা বাগদা চিংড়ির প্রোটোজোয়াজনিত রোগ হতে পারে।

রোগের কারণ : *Zoothamnium, Epistylis, Vorticella, Acineta, Opercularia, Vaginicola, Podophyra* ইত্যাদি প্রোটোজোয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগর লক্ষণ : চিংড়ির খোলস, পুষ্টিতন্ত্র ও ফুলকার ক্ষতি হয়। আক্রান্ত চিংড়ির চলাচল, খাদ্য গ্রহণ ও খোলস পাল্টানো বাধাগ্রস্থ হয়। চিংড়ি স্বাভাবিক বর্ধন হার ব্যহত হয়।

প্রতিকার : Formalin, Merthiolate, Copper-based-algicides ব্যবহার করে প্রতিকার পাওয়া যায়। উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা এ রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভাল পথ।

(৬) অপুষ্টিজনিত রোগ

গলদা এবং বাগদা উভয় চিংড়িই অপুষ্টিতে ভুগতে পারে।

(ক) খোলস নরম রোগ/স্পঞ্জের মত দেহঃ

চাষাবাদের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই গলদা চিংড়ির এ রোগ হয়। আবার বর্ষাকালে ঘেরে পানির লবণাক্ততা কমে গেলে বাগদা চিংড়িও এ রোগে আক্রান্ত হয়।

কারণ ঃ পানিতে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া

- পানিতে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যাওয়া।
- পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া
- সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব
- অনেক দিন পানি পরিবর্তন না করা।

লক্ষণ : খোলস নরম থাকে অর্থাৎ খোলস বদলানোর ২৪ ঘন্টা পরও খোলস শক্ত হয় না।
দেহ ফাঁপা হয়ে স্পঞ্জের মত হয়। চিংড়ির বর্ধন ব্যহত হয় এবং চিংড়ি ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে মারা যায়।

প্রতিকার : পুকুরে ২-৩ মাস পর পর ০.৫-১ কেজি/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ এবং খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এ সমস্যার সুফল পাওয়া যায়।

(খ) খোলস পাল্টানোর পর মৃত্যুঃ

কারণঃ খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, ফ্যাটি এসিড, আমিষ ও খনিজ লবণের অভাব।

লক্ষণ : দেহ নরম থাকে এবং রং নীলাভ হয়ে যায়। চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং চিংড়ি ক্রমশ দূর্বল হয়ে মারা যায়।

প্রতিকার : পরিমিত পরিমাণ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করতে হবে।

উপরোক্ত রোগ-বালাই ছাড়াও আরও কিছু রোগ চিংড়ি খামারে নিয়মিত দেখা যায়। যেমন-

গায়ে শেওলা পড়াঃ

কারণ : বদ্ধ পানিতে অতি মাত্রায় খাদ্য ও সার প্রয়োগে সবুজ শেওলার আধিক্যের কারণে এ সমস্যা হয়ে থাকে। শীতকালে গলদা চিংড়ির পুকুরে এ রোগ বেশি দেখা যায়।

লক্ষণঃ চিংড়ির দেহের উপরিভাগে সবুজ শেওলার আস্তরণ দেখা যায়। চিংড়ি খোলস পরিবর্তন করে না এবং চলাচলের গতি মন্থর হয়ে যায়। বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং চিংড়ি আস্তে আস্তে মারা যায়।

প্রতিকার : দূষিত পানি বের করে দিয়ে পুকুরে নতুন পানি দিতে হবে। নিয়মিত বিরতিতে পানি পরিবর্তন করতে হবে। পানির প্রবাহ বাড়িয়ে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। চুন সার ও খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা সীমিত রাখতে হবে।

চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

চিংড়ির ঘেরে/পুকুরে একবার রোগের সংক্রমণ শুরু হলে, বিশেষ করে ভাইরাসের আক্রমণ হলে, বলতে গেলে কিছুই করার থাকে না। তাছাড়া চিকিৎসা দিয়ে আক্রান্ত চিংড়িকে সারিয়ে তোলাটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করাই উত্তম। FAO -এর মতে চিংড়ির রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ হলো নিম্নমানের চাষ ব্যবস্থাপনা, অস্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশ, আমদানী করা চিংড়ির জন্য অপর্যাপ্ত সংগনিরোধ ব্যবস্থা (Quarantine procedure) প্রভৃতি। পানির গুণাগুণের (যেমন-তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, O_2, p^H, দ্রবীভূত বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি) হঠাৎ নাটকীয় পরিবর্তনের ফলে ভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা গেছে। তাই বলা যেতে পারে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের পূর্বশর্ত। নিম্নে রোগ প্রতিরোধের সাধারণ উপায়গুলো বর্ণনা করা হলো-

১. হ্যাচারিতে নেওয়ার আগে ব্রুডস্টক এবং চাষের পুকুর/ঘেরে মজুদের আগে PL (Post Larvae) রোগ মুক্ত কিনা তা যাচাই (Screening)করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে SPF ব্রুড ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও ভাইরাসমুক্ত পোনা উৎপাদন ও মজুদ করতে হবে।

২. হ্যাচারি ও পুকুরে যথাক্রমে পোনা উৎপাদন ও মজুদের যাবতীয় কার্যক্রম শুরুর পূর্বে অবশ্যই সেগুলো ভালোমত জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

৩. ঘের/পুকুরের পরিবেশ চিংড়ির জন্য উপযোগী রাখার স্বার্থে পানির ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুণের হঠাৎ পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. পোনার মজুদ ঘনত্ব নিয়মের মধ্যে রাখতে হবে এবং অতিরিক্ত পোনা মজুদ করা যাবে না।

৫. মাংসজাতীয় খাবার কাচা অবস্থায় না দেওয়াই শ্রেয়। তাছাড়া বাসি-পচা ছাতা ধরা মেয়াদ উত্তীর্ণ নিম্নমানের খাবার দেওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে।

৬. চাষাবস্থায় ঘের/পুকুরের পানি পরিবর্তন (Water exchange) ন্যূনতম মাত্রায় রাখতে হবে যাতে করে নতুন পানির সাথে ভাইরাসের বাহক (Virus carrier) প্রবেশ করতে না পারে। তাছাড়া জলাশয়ে অবাঞ্চিত ও ক্ষতিকর প্রাণির/পোকার প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

৭. জলাশয়ে পরিমিত পরিমান চুন সার ও সুষম খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

৮. জলাশয়ের চারিদিকে শক্ত-পোক্ত ও উচুঁ বাঁধ নির্মান করতে হবে। যাতে বন্যার পানি ও পাশ্ববর্তী ঘের থেকে চুয়ানো পানি প্রবেশ করতে না পারে।

৯. নিয়মিতভাবে চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ঘেরে রোগাক্রান্ত ও মরা চিংড়ির উপস্থিতি টের পাবার সাথে সাথে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।

১০. এক জলাশয়ে ব্যবহৃত জাল ও অন্যান্য উপকরণ অন্য জলাশয়ে ব্যবহারের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধন (Disinfect) করে নিতে হবে।

১১. চিংড়ি চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং যত্রতত্র মলমূত্র, থুতু ও আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ অভ্যাস হ্যাচারি থেকে শুরু করে চাষের ঘের পর্যন্ত সমানভাবে মেনে চলতে হবে।

১২. আহরণোত্তর ঘেরের পানি ও তলার কালো কাদা শোধন না করে সরাসরি অন্যত্র ফেলা যাবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	**গলদা ও বাগদা চিংড়ির রোগের কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবেন।**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশে চিংড়ির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়ি চাষের পরিধি বৃদ্ধি এবং প্রচলিত সনাতন চাষ পদ্ধতি থেকে আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ক্রমোন্নতি-ই এর প্রধান কারণ। চিংড়ি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার পাশাপাশি রোগবালাই সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞান থাকলে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে চিংড়িকে সুস্থ-সবল রেখে ভালো ফলন নিশ্চিত করা সম্ভব। সনাতন চাষ পদ্ধতিতে প্রথমদিকে তেমন রোগ বালাই ছিল না বা চিংড়ি চাষীরা এ ব্যাপারে তেমন সচেতন ছিলেন না। তবে চিংড়ি চাষে নিবিড়তা বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রোগবালাই ও আপদ বাড়তে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাগদা চিংড়ি চাষে হোয়াইট স্পট বা চায়না ভাইরাস রোগ মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। চিংড়ির মহামারীর নাম কি?

(ক) সাদা দাগ রোগ (খ) নরম খোলস রোগ
(গ) খোলস না পাল্টানো রোগ (ঘ) কালো দাগ রোগ

২। কোন রোগের কারনে চিংড়ির মাখা হলুদ হয়ে যায়?

(ক) হোয়াইট স্পট রোগ (খ) ইয়েলোহেড রোগ
(গ) ব্ল্যাক স্পট রোগ (ঘ) অপুষ্টিজনিত রোগ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

বাগদা চিংড়ি চাষী রমিজ মিয়া সকাল বেলা তার ঘেরের পাড়ের উপর দিয়ে হাটতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন বেশ কিছু চিংড়ি কিনারার কাছে অসাড় হয়ে বসে আছে। তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করে দেখলেন চিংড়িগুলোর খোলস এবং ক্যারাপেসে সাদা সাদা দাগ

৩। চিংড়ির খোলসে সাদা দাগের কারণ কী?

(ক) ভাইরাস (খ) ব্যাকটেরিয়া
(গ) ছত্রাক (ঘ) পরজীবী

৪। চিংড়ির এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের উপায় কোনটি.

i. এন্টিবায়োটিক ব্যবহার
ii. প্রতিকারের যুৎসই কোন উপায় নাই
iii. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i ও ii

পাঠ-৪.৪ ব্যবহারিক : বাহ্যিক লক্ষণ দেখে সুস্থ রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্তকরুন

প্রাসঙ্গিক তথ্য :

দেহের বিভিন্ন অংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আচরণ দেখে সুস্থ-সবল মাছ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মাছ সুস্থ্য না হলে মাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায় না। কাজেই মাছ চাষে লাভ করতে হলে মাছের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। সুস্থ মাছের কিছু বাহ্যিক লক্ষণ রয়েছে যা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে সুস্থ সবল মাছ শনাক্ত করা যায়।

অপরদিকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংক্রমণে বা পরজীবীর আক্রমণে মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মাছ ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক লক্ষণ প্রদর্শন করে থাকে। বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্তকরণের জন্য মাছের আচরণ এবং বিভিন্ন অংগসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের অসংগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাহ্যিক লক্ষণ সাধারণত খালি চোখে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

(১) জাল (২) কিছু পরিস্কার পানিসহ একটি পাত্র/গামলা (৩) নিক্তি/দাড়িপাল্লা (৪) কলম, পেন্সিল, সাদা কাগজ (৫) আতশ কাঁচ/অনুবীক্ষণ যন্ত্র (৬) পেট্রিডিশ (৭) ব্যবহারিক খাতা ইত্যাদি।

কাজের ধারা:

(১) জাল ব্যবহার করে পুকুর/জলাশয় থেকে মাছের নমুনা সংগ্রহ করুন ও সংগৃহীত নমুনা মাছ পাত্রের পানিতে রাখুন।
(২) নমুনা মাছ সতেজ, সবল কিংবা দুর্বল কি-না পর্যবেক্ষণ করে দেখুন।
(৩) দেহের ঔজ্জ্বল্য ভাব আছে কিনা দেখুন।
(৪) ফুলকার রং স্বাভাবিক কিনা কিংবা পচনের চিহ্ন আছে কিনা দেখুন।
(৫) মাছের শরীরে মিউকাস (mucus)-এর নিঃসরণ স্বাভাবিক কিনা দেখুন।
(৬) পাখনাগুলো দুমড়ানো মোচড়ানো অথবা ভাঙ্গা কিনা ভালভাবে দেখুন।
(৭) চোখ ফোলা কিংবা অক্ষিকোটরের বাইরে চলে এসেছে কিনা লক্ষ্য করুন।
(৮) পায়ুপথে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা আছে কিনা লক্ষ্য করুন।
(৯) দেহের কোথাও কোন প্রকার ঘা, ক্ষত বা পচন আছে কিনা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করুন।
(১০) দেহের কোথাও কোন পরজীবী লেগে আছে কিনা ভালোমত লক্ষ্য করুন এবং পরজীবী থাকলে তা আতশ কাঁচ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করুন।
(১১) দেহের কোথাও কোন রক্তক্ষরণের চিহ্ন আছে কিনা দেখুন।
(১২) মাথা দেহের তুলনায় বড় কিনা লক্ষ্য করুন এবং নমুনা মাছের পেট অস্বাভাবিক রকম ফোলা কিনা লক্ষ্য করুন।
(১৩) মাছের কাঙ্খিত বৃদ্ধি হয়েছে কিনা তা নমুনা মাছের ওজন থেকে পুকুরে ছাড়ার সময়কার ওজনের (প্রাথমিক ওজন) পার্থক্য থেকে বোঝার চেষ্টা করুন।

পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত :

(১) (ক) তাত্ত্বিক পাঠের "সুস্থ ও রোগাক্রান্ত মাছের লক্ষণের সাথে আপনার পর্যবেক্ষণগুলো তুলনা করুন এবং আপনার সিদ্ধান্ত খাতায় লিখে রাখুন।
(খ) পরিশেষে পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন এবং আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে স্বাক্ষর করিয়ে নিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মাছ চাষ বেশ লাভজনক। তবে মাঝে মাঝে প্রতিকূল পরিবেশ এবং জীবনাণুঘটিত কারণে মাছ চাষে ক্ষতি হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরন করে মাছ চাষ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে আসে এবং লাভের আশা উজ্জ্বল হয়।

(ক) রোগ কী?

(খ) মাছের রোগের কারন ব্যাখ্যা করুন।

(গ) মাছের যাতে রোগ না হয় সেজন্য কী করনীয় বর্ণনা করুন।

(ঘ) "মাছের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম" – এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কী?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ